A Peer-Reviewed Article
ISSN: 3136-9049
eISSN: 3136-9057

North Bengal International University Journal
https://journal.nbiu.edu.bd

বনফুলের নির্বাচিত গল্প : বিষয়বৈচিত্র্যে অনন্যতা

The Uniqueness of Thematic Diversity in Bonoful's Selected Short Stories

Mst. Noor-E-Elis Aktar Jahan*

Abstract

In the horizon of Bengali short stories Bonoful (Balai Chand Mukhopadhyay, 1899-1979) takes a distinctive and special place. His understanding of life and society allowed him to show the deep and fundamental laws of human life on the pages of his works. Different aspects of human life, despite the seeming simplicity and brevity of the story, are folded in it in a multi-layered way. Social, political, historical, mythological, anthropological, scientific, astrological, poetic, philosophical, psychological, and ethical aspects can be noticed in his stories. The ability to depict life in all its facets, to understand its multiplicity, is wittily combined in his works with an analysis of many aspects of human life. The author's attempts to reveal the unique features of the selected stories and the analysis of their nature are the subject of the present article.

Keywords: Bonoful selected stories, Human life, subject-matter, Uniqueness, Social reality, Love connection, Humor.

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) সাহিত্যাঙ্গনে কবি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। উপন্যাস রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত কিন্তু গল্প লেখার কলাকৌশল তাঁকে গল্পকার হিসেবে বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে যা অন্য কোন শাখায় অপ্রতুল। তাঁর গল্পের সংখ্যা পাঠকের মনকে বিস্মিত না করে পারে না। প্রায় ছয়শো এর অধিক গল্প লেখে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে তিনি যেমন সমৃদ্ধ করেছেন তেমনি নিজেকে পৌঁছে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যাঙ্গনের শীর্ষস্থানে। আমার আলোচ্য বিষয় তাঁর বিশেষ কিছু গল্প।

---

*Associate Professor, Department of Bangla, North Bengal International University, Rajshahi, Bangladesh.

মানুষের জীবনের অদেখা দিককে পাঠকের সামনে রসময় ও শিল্পমণ্ডিত করে উপস্থাপন করা যেন বনফুলের গল্প লেখার মূল প্রেরণা। জীবনের রস নিংড়ে অমৃতসাধন করা যে সম্ভব তো তাঁর গল্প পাঠমাত্রই অনুমেয়। মানুষের জীবনের বৈচিত্র্যময় নানা অনুষঙ্গ অন্তর্নিহিত থাকে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ব্যক্তি বিশেষে মানুষ চালচিত্র সৃষ্টি করে বা মানসিকতার নানা পরিচয় দেয়। জীবনকে প্রতিবিম্বরূপে দেখার যে সহজাত হিসেবে তা বনফুল করেছিলেন খুব সূক্ষ্মভাবে।

তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে যুগ-প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে বনফুলের কথাসাহিত্যে বিষয়বৈচিত্র্যের তাৎপর্য অনুসন্ধান করার বিষয়। এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা নিঃসন্দেহে পাঠককে মুগ্ধ করে। সমাজের খুব কম বিষয়ই আছে যেখানে তাঁর হাত পড়েনি। তাঁর শিল্পীমন ঘুরে বেড়িয়েছে দেশ-বিদেশের সাহিত্য-চর্চার অঙ্গনে। বিষয়বস্তুর অভাবে তাঁকে কোনদিন ভুগতে হয়নি। বিচিত্র বিষয় নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি অনায়াস দক্ষ ছিলেন।[১]

ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নানা অনুষঙ্গ তিনি খুব সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর গল্প পরিক্রমায়। একটি গল্পে জীবনের বহুমাত্রিক প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের জীবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ঘটনার সমন্বয় তার প্রকাশ পাওয়া যায় ‘মানুষ’ গল্পটিতে। গল্পের শুরুতে প্রকৃতির মনোহর দৃশ্য পাঠকচিত্তকে আন্দোলিত করলেও গল্পের পরতে পরতে পরিবর্তনের যে ধারা তা প্রবাহমান মানব-জীবনের সার্বিক দিককে উপস্থাপন করে। আলো-আঁধারের খেলা যেন চলতে থাকে মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনে আর তা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সুখ ও দুঃখ, দুঃসংবাদ ও সুসংবাদ, স্বাস্থ্য ও ব্যাধি, যুবতী ও পৌঢ়া, সুন্দর ও বিভৎস যেন মানব-জীবনে একে অপরের পরিপূরক। চীন-জাপান যুদ্ধ, স্পেন, কংগ্রেস চালচিত্র পাঠককে পৌঁছে দেয় বৈশ্বিক রূপরেখায়। জীবনকে স্বচ্ছরূপে অনুধাবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে ‘মানুষ’ নামক গল্পটিতে।

বৈচিত্র্যময় মানুষকে প্রকাশ করতে গিয়ে বনফুল তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছেন খুব সূক্ষ্মভাবে। বস্তুজগতে মানুষের চারিত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে আর সে বৈশিষ্ট্যকে মানুষ তার স্বকীয়তা ভাবে। অনেক সময় নিজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে থাকতে আত্মপ্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু মানুষের জীবনে কখনও কখনও এমন কিছু মূহূর্ত আসে যখন মানুষ তার প্রিয়জন বা প্রিয়পাত্র হারানোর ভয়ে স্রোতের বিপরীতে হলেও অবস্থান করে। এমনই এক কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুহূর্তের গল্প ‘মানুষের মন’।

নরেশ ও পরেশ দুই ভাই বাহ্যিক অবয়বে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, শিক্ষা-দীক্ষায় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। তাদের দুই ভাইয়ের জীবনের মূল চালিকাশক্তি পিতৃ-মাতৃহীন একমাত্র ভাতুষ্পুত্র পল্টু যখন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী তখন তারা দুজনেই চেয়েছে নিজের মতাদর্শে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করতে। করেওছিলো তাই কিন্তু দুজনের চিকিৎসা পদ্ধতির কোনটা যখন ফলপ্রসূ হলো না তখন তারা দু'ভাই দিশেহারা হয়ে পড়লো। যে কোন মূল্যে সুস্থ করতে হবে, ফিরে পেতে হবে পল্টুর জীবন। এজন্য তারা তাদের সারাজীবনের ব্যক্তিসত্তাকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না। পল্টুর মুমূর্ষু অবস্থা দেখে নরেশ ও পরেশ দু'ভাই তাদের মতাদর্শ, চিন্তাচেতনাকে বিসর্জন দিয়ে যে কোন মূল্যে পল্টুকে বাঁচাতে

চায়। নরেশ ও পরেশ দু'ভাই পল্টুকে বাঁচানোর জন্য যা করে তা মানুষের সহজাত আচরণ। প্রিয় মানুষকে কেউ হারাতে চায় না, তাকে বাঁচানোর জন্য শেষ চেষ্টাটুকু মানুষ করে। সেজন্য হয়তো সামান্য খড়কুটো আঁকড়ে ধরতেও দ্বিধা করে না। বনফুল তাঁর 'মানুষের মন' গল্পের মধ্য দিয়ে সেই চরম সত্যটুকুই প্রকাশ করেছেন।

বনফুল তাঁর গল্পের উপকরণ হিসেবে মানব-জীবনের বহুমাত্রিক রূপকে উপস্থাপন করেছেন। মানুষ, সমাজ ও মানব-জীবনের বিচিত্র চিত্র তিনি উপস্থাপন করেছেন গল্পের মাধ্যমে। এমনকি মানুষের মনস্তত্ত্বকেও তিনি অনুধাবন করেছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলোর মধ্যে তাঁর অসাধারণ একটি গল্প 'ছেলে মেয়ে'। আন্নাকালী ও নমিতা দুজন নারীর কথোপকথের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে সমাজের প্রকট সমস্যা, সামাজিক মূল্যবোধ। নারী জাতির অবমূল্যায়ন তৎকালীন সমাজের একটি নিত্যনৈমিত্তিক চিত্র যা 'ছেলে মেয়ে' গল্পে উপস্থাপন করেছেন বনফুল। আন্নাকালী ও নমিতা দুজনেই সন্তান প্রসবের জন্য হাসপাতালে আসে, দুজনের মধ্যে খুব অল্প সময়ে সখ্য হয়ে যায়। আলাপচারিতা চলতে থাকে তীব্র গতিতে। তাদের কথোপকথনের মূল বিষয়বস্তু তাদের স্বামী। দুজনের মধ্যেই দেখা যায় পুরুষ-বিদ্বেষী মনোভাব। স্বামীর কথা-বার্তা, চাল চলন, দৈনন্দিন কার্যক্রম কোন কিছুই যেন তাদের মন মতো না। তাদের জীবনের উপলব্ধি পুরুষ মানুষ স্বার্থপর, অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী, বিশ্বাসঘাতক। আন্নাকালী একসময় বলেঃ

> অমন নেমকহারাম্ জাত আর আছে না কি! এই ধর না যে ছেলেকে পেটে ধরে বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করি আমরা, সেই ছেলেই বিয়ে করে একেবারে পর, মায়ের দিকে ফিরেও চায় না। সেই বউও আবার কিছু দিন পরে পানসে হয়ে যায়, তখন আবার অন্যদিকে নজর-স্বার্থপর পাজি সব![২]

পুরুষ জাতির প্রতি এমন বিরূপ মনোভাব থাকার পর যখন সন্তান প্রসব করে তখন আন্নাকালী কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়াটাকে কোনভাবেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছিলো না। যেহেতু তার প্রত্যাশা ছিলো পুত্র সন্তান এবং জ্যোতিষী বলেছে এবার পুত্র সন্তান হবে। সবকিছু মিলিয়ে আন্নাকালী কন্যা সন্তানকে কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারছিলো না, চিৎকার করে কান্নাকাটি করেছে। নার্সদের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ নার্সরা তার পুত্র সন্তানকে নমিতার কন্যা সন্তানের সাথে পরিবর্তন করে দিয়েছে। এদিকে নমিতাও তার পুত্র সন্তানকে হারানোর ভয়ে বুকের কাছে টেনে নেয়।

বস্তুত এরূপ পরিস্থিতির জন্য নমিতা বা আন্নাকালী কেউ দায়ী নয়, এখানে দেখা যায় সমাজ-বাস্তবতা তাদেরকে বাধ্য করেছে এই মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করতে। সামাজিক রীতি বা প্রথা অনুযায়ী নারী সবসময় পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল। শিশুকালে বাবা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে ছেলে যেন তার আশ্রয়স্থল তাই একজন নারী যদি পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে না পারে তাহলে তার পরবর্তী জীবনের নিরাপত্তার জায়গাটা যেন তৈরি হয় না। জীবনে বেঁচে থাকার অবলম্বন যেন আর থাকে না। তাই শুধু সমাজের পুরুষ নয় মাতৃরূপী নারী নিজেও চায় তার পুত্র সন্তান যা হবে তার ভরসার জায়গা। গল্পটির মধ্য দিয়ে এক অসাধারণ সামাজিক আর্কেটাইপ প্রকাশ পেয়েছে। 'ছেলে মেয়ে' শীর্ষক গল্পের মনস্তত্ত্ব

সর্বাংশে নারী-মনস্তত্ত্ব এবং সামগ্রিক বিচারে তা আমাদের সমাজমনস্তত্ত্ব। পৃথিবীতে মানুষ তার অবচেতনার সূত্রে বরাবরই শক্তির পুজারী। প্রচণ্ড পুরুষবিদ্বেষী আন্নাকালী তাই অষ্টমগর্ভের শিশুকে পুত্র শিশুরূপেই পেতে চেয়েছে।[৩]

নারীর প্রতি সববেদনা প্রকাশ বা নারীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বনফুলের গল্পের বিশিষ্টতার প্রকাশ। নারীর প্রতি সুদৃষ্টি এবং নারীর ব্যথায় ব্যথিত হওয়া বনফুলকে গল্পকার হিসেবে এক ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। একটি গল্প দিয়েও যদি বনফুলকে বিচার করতে হয় তাহলে ‘নিমগাছ’ গল্পের নাম প্রণিধানযোগ্য। এই গল্পটি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। কাব্যিক আঙ্গিকে অল্প কথায়,স্বল্প পরিসরে জীবনের ব্যপ্তিকে প্রকাশের যে শৈল্পিক সুষমা তা তাঁর এই গল্পে পাওয়া যায়। প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ‘নিমগাছ’ গল্পটি উপস্থাপন করেছেন গল্পকার। সমাজে বেশিরভাগ অবহেলিত নারীকে নিম বৃক্ষের সাথে তুলনা করছেন। বৃক্ষ যেমন আমাদের ফুল দেয়, ফল দেয়, ছায়া দেয়, বাতাস দেয়, ঠিক তেমনি পরিবারের গৃহকর্মা নিপুনা গৃহলক্ষ্মী বউটিও সেভাবে অতি যত্নে তার স্বামী, সন্তান সংসারকে যত্নে আগলে রাখে। নিমগাছ যেমন তার শেকড়, বাকড়, ছাল, ডাল, পাতা দিয়ে মানুষের নানাবিধ উপকার করে ঠিক তেমনি একজন যত্নশীলা নারী তার পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে তার কর্মের মধ্য দিয়ে সেবা দান করে থাকে।

নিমগাছের কাছে মানুষের প্রাপ্তির যেন শেষ নেই কিন্তু যত্নের কথা কারো মনে আসে না। তেমনি পরিবারের গৃহকর্মী লক্ষ্মী বউটিও অবহেলা, অযত্নে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে যায়। নিমগাছের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় কবি তাই সে অপলক তাকিয়ে থাকে গাছের দিকে, সৌন্দর্য উপভোগ করে। নিমগাছের ইচ্ছে করে তার সাথে চলে যেতে। পরিবারের সবাইকে এক সূতোয় গেঁথে রাখা নারীর কখনও কখনও ইচ্ছে করে পারিবারিক দায়দায়িত্ব থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে জীবনকে নিজের মতো উপভোগ করার। কিন্তু নিমগাছের মতোই তারও শেকড় পারিবারিক বন্ধনের গভীরে চলে যায়। নিজ ইচ্ছা, সাধ-আহলাদকে বিসর্জন দিতে হয়। ‘ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা।’[৪] বনফুলের ‘নিমগাছ’ গল্পটি রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পের মৃণাল কিংবা ‘বদনাম’ গল্পের সৌদামিনী মুক্তিপ্রত্যাশী নারীর আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। রূপকের আড়ালে বাংলার নারীজীবনের নানাবিধ ব্যঞ্জনার বহিপ্রকাশ যেন ‘নিমগাছ’ গল্পটি। বনফুলের অসাধারণ আরও একটি গল্প ‘নদী’। একই অঙ্গে নানা রূপ প্রকাশ যেন বনফুলের এই গল্পটি। প্রতীকী ব্যঞ্জনার গল্প লেখায় অদ্বিতীয় গল্পকার তিনি। গ্রামকেন্দ্রিক জীবন, শৈশব-স্মৃতি মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ। বাল্য বন্ধুর প্রতি মানসিক স্পৃহা যেন গল্পের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। উত্তম পুরুষে লেখা গল্পে লেখক নানাবিধ বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। গল্প কথকের বন্ধু পীতম্বরের একমাত্র সন্তান আদরিণী। অত্যন্ত আদর করে আদরিণী নাম রাখলেও সমাজ তাকে দারুণভাবে অনাদর করে। বাঙালি সমাজের চিরাচরিত ব্যাধি বর্ণ-বৈষম্য, যৌতুক প্রথা। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ ব্যাধি প্রকট রূপ ধারণ করে কতটা বিভৎস হয়েছে তা বোঝা যায় ‘নদী’ গল্পটিতে। পণের দায় আর গায়ের কালো বর্ণ একজন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে কী অসহায় করে তোলে তা পীতাম্বরকে দেখলে বোঝা যায়। বন্ধু সুধীরের ছেলে দীপঙ্করের সাথে বিয়ের কথাবার্তা হলেও শেষ পর্যন্ত কালো মেয়ে

এবং টাকা না পাওয়ার শঙ্কা থেকে সুধীর কোষ্ঠী মিল হয়নি বলে শেষাবধি বিয়েটা হতে দেয় না। এখানে বনফুল একটু ব্যতিক্রমী মনোভাবের পরিচয় প্রদান করেন। শেষাবধি গল্পের গতিপথ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। গল্পকথকের সাথে দীর্ঘ দিন পর দেখা হয় আদরিণীর, আদরিণীকে দেখে চিনতে না পারলে বলে, 'আমি মুসলমানকে বিয়ে করেছি। আপনাদের সমাজে তো ঠাঁই পেলাম না। এরা আমাকে আদর করে নিয়েছে, আদর করে রেখেছে, আমি সুখে আছি।'[৫]

গল্পকার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এখানে। তৎকালীন হিন্দু সমাজের রীতিনীতি, কুসংস্কারকে কটাক্ষ করে গল্পটি উপস্থাপন করে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সোনাপুর গ্রামের তরলা নদী গতি পরিবর্তন করে রহিম গঞ্জের শোভার্বধন করেছে। গল্প শেষে নদীর গতি পরিবর্তনের যে রূপরেখা গল্পকার অঙ্কন করেছেন তা যেন ধর্ম, জাতি সম্প্রদায়ের রূপ রেখার পরিচয় বহন করে।

শিল্পসৃষ্টির অঙ্গীকারে জীবন প্রতীতির প্রতিরূপ সৃষ্টি করে বনফুল তাঁর ছোটগল্পকে স্বমহিমায় ভাস্বর করে তুলেছে। নিম্নমধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের জীবন স্বরূপের প্রতিচিত্র অঙ্কনে বনফুলের প্রয়াস অনায়সলব্ধ। ক্যানভাসের ব্যাপ্তি নয়, জীবন-প্রবাহের ক্ষুদ্র-খণ্ড টুকরো চিত্রসমূহই শিল্পী বনফুলের ভিন্ন এক শিল্প-অভিজ্ঞানের পরিচায়ক। সমাজের সাধারণ-মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার-অস্তিত্ব, সংশয়-বেদনা-বঞ্চনার ক্ষুদ্রচিত্র অভিপ্রকাশ বনফুলের জীবনবোধের বিশিষ্টতাকে আলোকিত করেছে। এক্ষেত্রে বনফুল গল্পশিল্পের নির্দিষ্ট কাঠামো ও পদ্ধতি পরিহার করে স্বতঃস্ফুর্ত জীবনদৃষ্টির অনুগামী।[৬] নারীর প্রতি মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা বনফুলের গল্পগুলোকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, উপেক্ষিত নারীদের প্রতি তাঁর সুদৃষ্টি বিশেষভাবে তাঁকে মহিমান্বিত করে। বনফুলের 'মৃত্যুঞ্জয়' গল্পটি তেমনই এক সৃষ্টি। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও নাটকীয় ভঙ্গিতে গল্পটির শুরু হয়। বিধবা-বিবাহ বাঙালি সমাজে একটি বড় সমস্যা। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিধবাকে বিয়ে করা এক ধরণের অপরাধ যেন। নারী তার ব্যক্তিগত জীবনে যত কষ্টেই থাকুক না কেন তার যেন অধিকার নেই দ্বিতীয় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। পুরুষশাষিত সমাজ ব্যবস্থায় কোন বিধবা নারীকে যদি কোন পুরুষ ভালোবেসে বিয়ে করতে চায়, তাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দিতে চায় তাহলে আমাদের সমাজ সেখানে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। 'মৃত্যুঞ্জয়' গল্পে বিধবা নারী ঝুমরিকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চায় রামটহল। ঝুমরির প্রথম স্বামীর দুই মেয়ে সুখিয়া ও দুখিয়াকেও রামটহল মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের লেখাপড়া, ভরণপোষণ এমনকি বিয়ের দায়িত্ব পর্যন্ত নিতে সম্মত হয় রামটহল। রামটহল যখন ঝুমরিকে বিয়ে করতে আসে তখন এ বিয়েতে বাদ সাধে ঝুমরির জাঠতুতো ভাই শিবলাল। শিবলালের বক্তব্য:

> যদিও কাহার সমাজে বিধবারা 'চুমানা' নামে একটা করে প্রহসন করিয়া দ্বিতীয় একটা পুরুষের সঙ্গে বাস কিন্তু সেটা কি উচিত না শোভন? বাধ্য না হইলে কাহারও 'চুমানা' করা উচিত নয়?[৭]

প্রতিবাদে ঝুমরি বলেছিলো:

> আমি স্বেচ্ছায় কুয়ায় ঝাঁপ দিচ্ছি তোমাদের তাতে কি? আমার ভৌজি (বৌদি) যখন মেরে আমাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল তখন তোমরা কেউ আমাকে বাঁচাতে আসনি। আমি বাবুদের বাড়িতে 'নকরি' করে অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন তোমরাই আমার নামে ফুসফুস গুজগুজ করে নানারকম বলতে। দুই-তিনটে বদমাস গুণ্ডা সত্যিই রোজ আমার পিছু পিছু ঘুরত, কিন্তু কই তোমরা তো কেউ এসে তাদের আটকাওনি। আমি নিজে রোজকার করেই খেয়েছি, তোমরা কেউ কোনদিন ডেকে আমাকে একমুঠো খেতেও দাওনি। এখন আমি একজনকে পছন্দ করে 'চুমানা' করতে যাচ্ছি আর তুমি ফকরদালালি করতে এসেছ।[৮]

বাঙালি নারীর চিরন্তন বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে ঝুমরির এ উক্তির মধ্য দিয়ে। আমাদের সমাজ নারীর এমন অসহায়ত্ব যেন উপভোগ করে। একটুখানি সুখের আশায় নারী যখনই কোন স্বপ্ন দেখে, নিজেকে একটু ভালো রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তখনই সমাজের কতিপয় ব্যক্তিবর্গ সে ভালো থাকা সহ্য করতে না পেরে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

'মৃত্যুঞ্জয়' গল্পে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা শিল্প, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মানুষের চেতনসত্তার অন্তরালে অবচেতন মন কিভাবে ক্রিয়াশীল থাকে তা বোঝা যায় এ গল্পে নামচরিত্রে অবস্থানকারী মৃত্যুঞ্জয়ের উপস্থিতিতে। এখানে গল্পকার কিছুটা অ্যাবসার্ড তৈরি করেছেন। গল্পের শেষে যে নাটকীয়তা হয়েছে তা পাঠককে চমৎকৃত করে। গল্প পাঠকালে কোনভাবেই পাঠক অনুমেয় নয় যে মৃত্যুঞ্জয় অশরীরী আত্মা ঝুমরির প্রথম পক্ষের স্বামী। গল্পের শেষ দৃশ্যপটে এবং শেষ বাক্যে গল্পকার কৌশলী উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠককে চমৎকৃত করে আর এখানেই বনফুলের বিশেষত্ব।

প্রেমের প্রতীকী ব্যঞ্জনাস্বরূপ সম্রাট শাহজাহান তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন আর এই তাজমহল নিয়ে অনেক কবি, সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেছেন। প্রেমের গভীরতা প্রকাশে তাজমহলের যে ভূমিকা তা বিশ্ববিখ্যাত। শ্বেত পাথরের নির্মিত সম্রাট শাজাহানের তাজমহল জনমনে যে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে তা সত্য কিন্তু বনফুল তাঁর 'তাজমহল' গল্পে প্রেমকে মহিমান্বিত করতে যে কাঠামো তৈরি করেছেন সেটাও তুলনা রহিত। ধন, সম্পত্তি, অর্থ দিয়ে প্রেমের নিদর্শন স্থাপন করা যতটা সহজ স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির তাড়নায় ভালোবাসার তাজমহল স্থাপন করা ততটা সহজ নয় যা বনফুল এ গল্পে দেখিয়েছেন। 'ক্র্যাংক্রাম অরিস' রোগে আক্রান্ত যার মুখে পচন ধরেছে এরকম একজন স্ত্রীকে কাঁধে ঝুলিয়ে হাসপাতালে আসা। হাসপাতালের বারান্দার জায়গা হয়নি পচনের দুর্গন্ধে, আশ্রয় হয় হাসপাতাল সংলগ্ন একটি গাছের নিচে, চাদরের আচ্ছাদনে মুষলধারে বৃষ্টিকে আটকানোর চেষ্টা যেন স্ত্রীর গায়ে বৃষ্টি না পড়ে। এসব কিছু একজন মহৎ হৃদয়ের প্রেমিক পুরুষ হিসেবে দেখা যায় বৃদ্ধ স্বামীটির মধ্যে। শত চেষ্টার পরও সকল চিকিৎসা ও চেষ্টাকে উপেক্ষা করে যখন রোগী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলো না তখন বিষয়টি হৃদয় বিদারক হয়েই পাঠকের কাছে ধরা দেয়। কিন্তু তারপরই যখন দেখা যায় ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে প্রচণ্ড খররোদ্রের মধ্যে বৃদ্ধ ইট আর কাদামাটি দিয়ে তার বেগমের কবর বাঁধাই করছে তখন

সেরকম দৃশ্য নিঃসন্দেহে পাঠকচিত্তকে আন্দোলিত করে। গল্প কথক যখন তার পরিচয় জানতে চায় তখন সে বলে ভিক্ষে করে বেড়ায় সে, নাম তার ফকির শাজাহান।

'তাজমহল' গল্পের লেখক নিজেও একজন চিকিৎসক, গল্পকথকও চিকিৎসক। এ হিসেবে 'তাজমহল' গল্পের বিষয়বস্তু অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং জীবন্ত হয়ে পাঠকের কাছে ধরা দেয়। সম্রাট শাজাহান আর ফকির শাহজাহানের মধ্যে যে বিরোধ-বিন্যাস সৃষ্টি হয়েছে তা শিল্পাঙ্গিকে ভিন্ন মর্যাদা পায়। একজন ইতিহাসখ্যাত বাদশাহ শাহজাহান আর অপরজন ফকির শাহজাহান। উভয়ের মন প্রেমাসক্ত, উভয়ের আশ্রয় আগ্রায়। পার্থক্য মর্মর পাথর আর কাদা মাটির। 'তাজমহল' গল্পের ভাব-বস্তু মনে করিয়ে দেয় 'মেঘনাদবধ কাব্য'-কে। বনফুল 'তাজমহল' গল্পে যে থিম গ্রহণ করেছেন তা মাইকেল মধুসূদনের রাম-রাবণের চরিত্রের চিন্তা-চেতনার সাথে অনেকটা মিলে যায়। 'তাজমহল' গল্পে ইতিহাসচেতনা ,স্থানচেতনা, সময়পট বিবেচনা, প্রেমচেতনা চিকিৎসকসত্তা সব মিলিয়ে একটা সমগ্রতার সৃষ্টি হয়েছে যা গল্প সংহতিকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে এবং বনফুলের স্বতন্ত্র শিল্পিসত্তার অভিপ্রকাশ ঘটিয়েছে সহজেই।[৯]

বিচিত্রতার অন্বেষণ বনফুলের গল্পের মূল আকর্ষণ। গল্পের মাঝে আকস্মিকতা তৈরি যেন তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। 'জুলেখার ক্রন্দন' গল্পের শুরু জুলেখার ক্রন্দনের কারণ উদঘাটনের মধ্য দিয়ে। বয়সী তরুণী গভীর রাতে অঝরে কাঁদছে, কেন কাঁদছে তার কারণ বড়ই রহস্যজনক করে তুললেন লেখক। নারীমন রহস্যের আধার ,তারপর আবার ষোড়শী তন্বী। লেখক নারীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে যেয়ে গল্পটিকে রম্য রচনায় রূপ দিয়েছেন। একজন নারী গভীর রাতে কাঁদছে। তার কান্নার উদ্দেশ্য হতে পারে প্রেমঘটিত। স্বামীগৃহে অবস্থানকালে বিবাহপূর্ব পছন্দের পুরুষের কথা মনে হতে পারে। হতে পারে সুলেখার প্রথম সন্তান মারা যাওয়ার স্মৃতি মনে করে কান্না, আবার এমনটাও হতে পারে স্বামী বিপিনের কাছে আবদারের পরও একটি জনপ্রিয় সিনেমা দেখতে না পাওয়া, কাপড়ের পাড় পছন্দ করা বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদও কান্নার কারণ হতে পারে। গল্প শেষে বোঝা গেলো সুলেখার কান্নার আসল কারণ। দাঁতের ব্যথায় সুলেখা যে কান্না করছিলো তা প্রকাশিত হলো বিপিনের আগমনে। লেখক রম্যরসের মধ্য দিয়ে গল্পের যে ফ্রেম তৈরি করেছেন তা চমৎকার আবেশ তৈরি করে।

নারীর জীবনে স্বামীর অবস্থান কিংবা অসীম ধৈর্যের অধিকারী নারী কী রকম প্রতিব্রতা হতে পারে তা 'তিলোত্তমা' গল্পে পাওয়া যায়। স্বামী যেন নারীর জীবনে অমূল্য রতন, স্বামীর সুখ ভোগ কিংবা মানসিক প্রশান্তির জন্য নারী সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। যে স্বামীর জন্য এত ত্যাগ স্বীকার, স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনে নারী সেই স্বামী কে অন্যের হাতে সমর্পণ করতেও সঙ্কোচ করে না। কথায় বলে 'নারীর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।' 'তিলোতমা' গল্পের তিলোত্তমা যেন সেরকমই একজন নারী। নাম তিলোত্তমা হলেও তিলোত্তমার রূপসৌন্দর্য না থাকায় তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার উদ্যোগ নিলে তিলোত্তমা কোন প্রতিবাদ করে না। নিঃশব্দে মেনে নেয় স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের আয়োজন। এমন কী আশীর্বাদের সময়ে শাশুড়ি শাঁখ বাজাতে বললে তিলোত্তমা

শাঁখ বাজাতে শুরু করে। তিলোত্তমার স্বামী নেহাতই স্ত্রীর প্রতি সহমর্মী হয়ে তাৎক্ষণিক বিবাহ কার্যক্রম থেকে বিরত হয় তা না হলে চিরাচরিত নারীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাকেও স্বামীর প্রতি অনুরাগী হয়ে এ বিয়ে মেনে নিতে হতো। এই গল্পেও বনফুল সমাজের শোষিত, বঞ্চিত নারীর অন্তর্বেদনা অনুধাবন করে তা তুলে ধরেছেন। মানুষের ওপর গভীর ও ব্যাপক সহানুভূতি যেমন তাঁর ছিল তেমনি ছিল নিরাসক্তির গভীর গোপন টান। তাই মানুষের প্রবৃত্তি নিয়ে তিনি যেমন স্নিগ্ধ রসিকতা করেন, তেমনি তীক্ষ্ম খোঁচাও দেন। বৈজ্ঞানিক মেজাজ যেমন তাঁকে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি ধর্ম-অলৌকিকতার সহজ সংস্কারকেও তিনি অনায়াসে টেনে আনেন।[১০] 'জাগ্রত দেবতা' গল্পে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ বদ্ধমূল ধারণার পরিণতিতে কিরূপ ফল পেতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে। সনাতনপুরবাসীর প্রথাগত নিয়ম অনুযায়ী মহাদেবের ইচ্ছায় কেউ না কেউ পাগল হয়। এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এ বছর সেরকম কিছু না ঘটায় গ্রামবাসী কার্যকারণ সম্বন্ধ খোঁজার চেষ্টা করে। নানাজনের নানা মত এবং তাদের বিশ্বাস মহাদেব রুষ্ট হয়েছেন বিধায় গ্রামবাসীর মধ্যে কেউ পাগল হলো না। দেখা গেলো তাতে এলাকাবাসীর মনে নানা অকল্যাণের ভীতি দানা বাঁধে। কিন্তু গ্রামবাসী বিষয়টিকে মেনে নিলেও নীলমণি তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তার কাছে মনে হয়েছে এরকম হওয়াটা অসম্ভব তাই সে মহাদেবের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে বৈশাখের দ্বিপ্রহরে পাগল খুঁজতে বের হয়েছে। নীলমণির অবস্থা ছিলো এরকম:

> প্রখর রৌদ্রে চর্তুদিকে পুড়িয়া যাইতেছে। ঘরে ঘরে কপাট জানালা বন্ধ। নীলমণি কেবল রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রক্ত-চক্ষু স্ফীত-নাসা। ঘরে ঘরে খোঁজ করিতেছেন, পাগলটা কোথায় গেল? তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।[১১]

এরূপ পরিস্থিতিতে বোঝা গেল নীলমণি নিজেই এবার পাগল হয়েছে। কুসংস্কারবাদী মানুষের মন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় বিকারগ্রস্থ। বিশ্বাস যখন অতিমাত্রায় অন্ধত্বে পর্যবসিত হয় তখন তা মানুষের জন্য অনেক বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। গল্পের পরিণতি নির্মম এবং ট্র্যাজিক। কুসংস্কারবাদী মনোভাবের সাথে সাথে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের বিষয়টিও এখানে প্রতীয়মান হয়। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় চরম নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে বনফুল মানুষের জীবনানুভবকে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপন করেন। সেখানে নাটকীয়তা-নির্মমতা-নিষ্ঠুরতা-কারুণ্য-অসহায়ত্ব একাকার হয়ে মানুষের জীবনকে উপহাস করে।[১২]

'একই ব্যক্তি' শীর্ষক গল্পে গল্পকথক দ্বৈত চরিত্রে দ্বৈত বৈশিষ্ট্যে অবতীর্ণ হয়। গল্পের শুরু একটি চিঠিকেন্দ্রিক হলেও স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবনের স্মৃতিচারণ, বৈবাহিক জীবনে পাওয়া না পাওয়ার চালচিত্র এবং মানুষের অবচেতন মনের খামখেয়ালি ব্যক্ত হয়েছে। গান শুনতে শুনতে মৃত্যুবরণ এ যেন এক আবেশময় মুহূর্তের অবতারণা। খুব অনাকাঙ্ক্ষিত এবং আকস্মিকভাবে নীলিমার আবির্ভাব, নীলিমার ওপর প্রেতাত্মার প্রভাব, শ্রীমতী অসীমাসুন্দরী দেবীর মৃত্যু-পরবর্তী পুন আগমন এবং কথোপকথন সব যেন গল্প ভাবনায় অ্যাবসার্ড পরিবেশের সৃষ্টির করে পাঠকচিত্তকে চমৎকৃত করে।

বনফুল তাঁর গল্পের অবয়বে ভিন্নমাত্রা দিতে সদা তৎপর ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গল্পে পাঠক সবসময় আস্বাদন করেছে সাহিত্যরস। 'পাঠকের মৃত্যু' গল্প উত্তম পুরুষে লেখা। দশ বছরের ব্যবধানে একজন পাঠকের অনুভূতি কীভাবে ভিন্ন মোড় নেয় তার চমৎকার প্রকাশ এ গল্পটি। একটি উপন্যাস পড়ার আগ্রহ, পাঠাগ্রহে নির্ধারিত ট্রেনে না যাওয়া এবং বইয়ের শেষ পাতা না থাকায় বই মালিকের কাছে ক্ষোভের প্রকাশ। একজন বইপ্রেমী পাঠক যেভাবে নিজেকে উপস্থাপন করে ঠিক সেভাবেই আমরা এই গল্পকথককে উদ্বেলিত হতে দেখি। বিপত্তি ঘটে দশ বছর পরবর্তী সময়ে। দশ বছর পর যখন একই বই হাতে পায় পাঠক তখন বইটি পড়ার আগ্রহ থেকেই সে রাতে সেখানে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিলেও শেষাবধি বইটি পড়ার আসক্তি দেখা যায় না। এমনকি বইটি লেখার জন্য লেখকের প্রতি পাঠকের খেদোক্তি:

এমন রাবিশ মানুষ লেখে!
এ শেষ করা তো অসম্ভব।[১৩]

বই একই আছে, লেখকও একই আছে পরিবর্তন হয়েছে পাঠকের অভিরুচির। সময় ও বয়সের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন হয় তার চমৎকার প্রকাশ 'পাঠকের মৃত্যু' গল্পটি।

মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বনফুলের বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিরূপ হিসেবে তাঁর গল্পভাবনাতে উপস্থাপন হতে দেখা যায়। বয়সের সীমারেখা মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে কীভাবে মানুষকে বিপদগামী করতে পারে তার প্রকাশ হয় 'জৈবিক নিয়ম' গল্পটিতে। যৌবনের উন্মাদনা মানুষের আবেগকে প্রশমিত করে। বিশেষ করে একজন উঠতি বয়সী যুবক মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যেয়ে পৌরুষত্বের ভান দেখালে, নায়কোচিত আচরণ দেখাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

গল্পে মনস্তত্ত্বের স্বরূপ ও বৈচিত্র্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলেও ছেলেটির এমন পরিণাম অংকনে বনফুল ছিলেন নিরাসক্ত ও নির্মম। এখানে আবেগের আতিশয্য নেই, আছে ঘটনা প্রবাহের নৈর্বক্তিক রূপায়ণ। যৌবণধর্মের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে মেনে নিয়েও শুদ্ধাচারী বনফুল যুবক-ছেলেটির সার্বিক-আচরণের প্রতি কটাক্ষ করেছেন।[১৪]

আবার সমালোচক বলেছেন, 'তির্যক কটাক্ষ আর মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি যৌথ অনুভবের নাটকীয় যোগাযোগ।'[১৫]

বনফুল বিচিত্রতার সন্ধানী গল্পকার। বৈচিত্রের সম্ভারে পরিপুষ্ট করেছেন তার গল্পভাণ্ডার। মানুষ, সমাজ, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, রূপক, প্রতীক, ভৌতিক সব ধরনের বিষয়ের পাশাপাশি পশুপাখির প্রতিও তাঁর মনোযোগ ছিলো এক অসাধারণ অনুভূতি নিয়ে। মানুষের সাথে পশুপাখির হৃাদিক বন্ধনকে বনফুল গল্পে রূপ দিয়ে যে রস সৃষ্টি করলেন তা পাঠক চিত্তকে আন্দোলিত করে। 'গনেশ জননী' গল্পে পশুর প্রতি মানুষের মমত্ববোধ বনফুলের গল্পভাবনাকে দিয়েছে মাহাত্ম্য। ব্যক্তিগত জীবনে চিকিৎসক হওয়ায় সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিলো। তাই

জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পের রসদ জোগাতে পেরেছে অনায়াসে। হাতির বাচ্চাকে সন্তান-স্নেহে লালন-পালন করা, সেবা শুশ্রুষা করা, প্রতিবছর নতুন সাজে সাজানো আবার দোষ করলে তাকে শাসন করার প্রবণতাও দেখা যায় গল্পে। এদিকে হাতির বাচ্চার মানুষের মতো অভিমান, অভিমানে না খেয়ে থাকা সবকিছু যেন অভিনব এক মাত্রা যোগ করেছে। গল্পভাষ্যে:

> খাও লক্ষ্মী তো–লেবু দিয়ে কেমন বালি করে এনেছি। খেয়েই দেখ না একটু–গনেশ কুলার মতো কান দুটি নাড়িয়া ফোঁস করিয়া শব্দ করিল।[১৬]

সন্তানহীনা একজন নারীর জীবনে সামান্য পশু যে জীবনের কতটা জায়গা জুড়ে অবস্থান করে তা বোঝা যায়। গনেশ অসুস্থ হলে, একবেলা না খেলে মাতৃরূপী নারী কতটা বিচলিত হয় তা গল্প পাঠে বোঝা যায়। গণেশের চিকিৎসার জন্য অতি সাধের গহনা বন্ধক রেখে বাড়িতে ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করানোর উদ্যোগ প্রভৃতি যেন শ্বাশত মায়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে গল্পটির মাধ্যমে।

বনফুলের ছোটগল্প রচনার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ যে বিষয়সমুহ প্রতিফলিত হয়:

- মানুষের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান, মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
- নারী পুরুষের বিরোধধর্মী চিন্তা-চেতনা
- সামাজিক নানাবিধ সমস্যা উদ্‌ঘাটন
- কুসংস্কারের প্রতিফলন
- প্রেমঘটিত ব্যঞ্জনা
- অলৌকিকতার প্রভাব
- যুক্তিবাদী বিজ্ঞান-মনোষ্ক চিন্তার অন্বেষণ।

বনফুল তাঁর গল্পভাবনায় মানুষের বিচিত্র স্বভাবের গভীরে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং নিরাসক্ত ভঙ্গিতে মানুষকে দেখার প্রবণতা তাঁর গল্পকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। মানুষের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজের ব্যাধী, কুসংস্কার, ধর্মীয় চেতনা তিনি সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুধাবন করেছেন। বৈজ্ঞানিক মেজাজ যেমন তাঁকে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি ধর্ম-অলৌকিকতার সহজ সংস্কারকেও তিনি অনায়াসে টেনে আনেন।[১৭]

মানুষের প্রবৃত্তি নিয়ে বনফুল যেমন স্নিগ্ধ রসিকতা করেছেন তেমনি তীক্ষ্ণ খোঁচাও দিতে পিছপা হতে দেখা যায়নি। চরিত্রের বৈচিত্র্য, কাহিনির বর্ণনাকৌশল ও ঘটনার আকস্মিকতা তাঁর গল্পকে করেছে তাৎপর্যপূর্ণ এবং মৌলিক। তাঁর গল্পপাঠমাত্রই বোঝা যায় মানুষ ও সমাজের সঙ্গতি-অসঙ্গতি। গল্পে নতুন চেতনার প্রকাশ বনফুলের গল্প-পরিকল্পনার অভিনবত্ব এবং বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তির নিয়ামক আর এখানেই বনফুলের অনন্যতা।

তথ্য নির্দেশ

---

[১] সরোজমোহন মিত্র (সম্পাদিত) বিষয় বৈচিত্র্যে বনফুল: শনিবারের চিঠি, বনফুল সংখ্যা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

[২] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প*, (ঢাকা: সুচয়নী পাবলিশার্স, ২০১৩), পৃ. ১২০

[৩] মিজানুর রহমান খান, *বনফুলের ছোটগল্প: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ৮৬

[৪] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ১৫৩

[৫] তদেব, পৃ. ২৬৬

[৬] মিজানুর রহমান খান, *বনফুলের ছোটগল্প*, পৃ. ৮৭

[৭] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ২০৪

[৮] তদেব, পৃ. ২০৫।

[৯] মিজানুর রহমান খান, *বনফুলের ছোটগল্প*,পৃ. ১৮৫

[১০] ধীমান দাশগুপ্ত, *বনফুলের কথাসাহিত্য* (কলকাতা: বাণী শিল্প প্রকাশনী, ১৯৮২), পৃ. ৪৯

[১১] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) *বনফুলের ছোটগল্প*, পৃ. ৯২

[১২] মিজানুর রহমান খান, *বনফুলের ছোটগল্প*, পৃ. ৮৪

[১৩] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) *বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ৮৪

[১৪] মিজানুর রহমান খান, *বনফুলের ছোটগল্প*, পৃ. ৮৩

[১৫] উর্মি নন্দী, *বনফুল: জীবন, মন ও সাহিত্য* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭), পৃ. ২৬

[১৬] জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) *বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প*, পৃ. ১৭১

[১৭] ধীমান দাশগুপ্ত, *বনফুলের কথাসাহিত্য*, পৃ. ৪৯